ক্ষুদ্রঋণ: সুদ ও বাজারের সুব্যবস্থাপনা

সাজ্জাদ জহির

সকলেই স্বীকার করেন যে বাংলাদেশে এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিকাশ পরিচ্ছন্ন আইনি পথে চলেনি| অথবা, আইনি তদারকী না থাকায় এই খাত বিকাশের সুযোগ পেয়েছিল| 'অনিয়ম'-এর দুটো দিকের সঙ্গেই আমরা পরিচিত| একদিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুপস্থিতিতে দূরবর্তী স্থানে ঋণ সরবরাহের উদ্ভাবনী ব্যবস্থা প্রসারের সুযোগ ঘটে; অপরদিকে তদারকির অভাবে সঞ্চয়ের নামে গরীবের অর্থ আত্মসাতের দৃষ্টান্তও রয়েছে| তবে, সহজলভ্য অর্থে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যই হোক, আর ঋণ ব্যবসার কারণেই হোক, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় এ দেশে স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে| এমনকি অর্জিত পুঁজি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশাল আকার ধারণ করে অন্যান্য বাণিজ্যিক অঙ্গনে প্রসারিত হয়েছে| কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিক রূপও নিয়েছে| ক্ষুদ্রঋণের উলে-খিত বিকাশ ধারায় কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে| এসব প্রতিষ্ঠান কি কেবলই দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখবে? না কি তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডও সহজভাবে গণ্য করা হবে? দারিদ্র্য বিমোচনে জড়িত থাকায় এসব প্রতিষ্ঠান কি রাজস্ব কর-জালের আওতার বাইরে থাকবে? যদি দারিদ্র্য বিমোচনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার 'মাত্রাতিরিক্ত' হওয়া উচিত কি? না কি, সর্বোচ্চ সুদের হার বেঁধে দেওয়া উচিত? এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা সীমিত পরিসরে দুরূহ হলেও বিষয়গুলোতে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টায় এই নিবন্ধের অবতারণা| দেশে ইতিমধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বাজারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে দুটো বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে| একটি হলো ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুদের হার বেঁধে দেওয়া| অন্যটি হলো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রামীণ বা আঞ্চলিক ব্যাংকে উত্তরণ ঘটানোর ক্ষেত্র তৈরি করা|

অনেকে মনে করেন যে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কার্যকর হলে এসব সংস্থা আইনানুগভাবে জামানত নিয়ে মূলধনের সংকট মেটাতে পারে| এর বিপরীতে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসার প্রসার ঘটানোর কথা কোনো কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা জোরেসোরে প্রচার করে| এই ধারার প্রবক্তারা মনে করে যে, ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ড বিকশিত হয়ে এক পর্যায়ে মূল বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে| অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকভিত্তিক ঋণের সঙ্গে ক্ষুদ্রঋণের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই যা আদৌ সত্যি নয়|

এতে কোনোই দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই যে ঋণ প্রদান করা অর্থনীতির ভাষায় এক ধরনের সেবা, যা সরবরাহ করতে খরচ লাগে এবং যেটা পাবার জন্য ঋণগ্রহীতা দাম দিতে আগ্রহী| অর্থাৎ, সুদ একটি বিশেষ সেবার দাম| কোনো কিছুর দাম নিয়ে কথা উঠলেই নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে আমরা

সমধর্মী সেবার কথা বলছি এবং সেবার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে তার দামের হেরফের হতে পারে| তাই জোর করে দুটো ভিন্নধর্মী সেবা একই দামে বাঁধার কোনো যৌক্তিকতা নেই| কোনো বাজারে দাম বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন কেন হয় এবং তা কিভাবে কার্যকরী করা উচিত, সে ব্যাপারে সাধারণ যেসব ধ্যান-ধারণা রয়েছে, তা ঋণের বাজারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য| আসলে প্রতিটি সেবার ন্যায় ঋণ সরবরাহকে যেমন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা সম্ভব, তেমনি ভর্তুকি দিয়ে তা গরিবমুখী করাও সম্ভব|
বলাই বাহুল্য যে সনাতনী বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কর্মকান্ডে যেভাবে অফিসকেন্দ্রিক, ক্ষুদ্রঋণ তা নয়| ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতার দোরগোড়ায় ঋণের অর্থ পৌঁছে দেয়া হয়| প্রাথমিক দলগঠন, ঋণের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সপ্তাহ ভিত্তিক ঋণ সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় গ্রহীতা পরিবারের নানাবিধ সামাজিক তথ্যাদির সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যক| অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী পর্যায়ে দুর্গতি এলে সদস্যদের পাশে দাঁড়ানো রীতিতে রূপ নিয়েছে| এসবের কারণে, ক্ষুদ্রঋণের আওতায় ঋণসেবা যত সহজে অন্য পাঁচটি সরবরাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, ইত্যাদি) তা সনাতনী ব্যাংকের ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়|

বাংলাদেশে তিন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে-সরকারি, দেশীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিদেশী| সমধর্মী সেবার বাজারে অংশ নেওয়া পরও তিন ধরনের ব্যাংকের আমানত ও ঋণ সুদের হারে বেশ পার্থক্য লক্ষণীয়| এদের তুলনায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান গ্রাম পর্যায়ে স্বল্প শিক্ষিত এবং স্বপ্ন ঋণে আগ্রহী মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌঁছে দিতে গিয়ে অনেক বেশি (সেবা মাশুল বাবদ) খরচ করে| এদের মূলধনের কিছুটা সদস্য সঞ্চয় থেকে আসে, কিছু আসে স্বল্প-সুদে পিকেএসএফ-এর কাছ থেকে এবং অনেকেই অধিক সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও ঋণ নেওয়া|

অর্থাৎ খরচের হেরফের রয়েছে এবং একটি খরচের উপর নির্দিষ্ট মার্জিন ধরে একক কোনো সুদের হার বেঁধে দেওয়ার যৌক্তিকতা প্রশ্নসাপেক্ষ| উপরন্তু, সপ্তাহভিত্তিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কেউ ৪০ সপ্তাহ, কেউবা ৩৭ সপ্তাহ সময় বেধে দেয়| সময় অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিন্নধর্মী শিথিলতা দেখাতে পারে| ঋণ দেওয়ার সময় বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে যে কর্তন হয় সে ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষণীয়| এসবই বছর ভিত্তিক কার্যকরী সুদের হার নির্ণয়ে জটিলতার উদ্ভব ঘটায়| চায়ের পরিমাণ ও প্রকার চিহ্নিত না করে কাপ প্রতি চায়ের দাম বেধে দিলে তার কার্যকারিতা কতটুকু সম্ভব? বেধে দেওয়া দামে বিক্রি করেও একজন বিক্রেতা ছোট কাপে বা নিম্নমানের চা দিয়ে লাভ নিশ্চিত করতে পারেন| এ ধরণের বিচ্যুতি রোধ করার নিশ্ছিদ্র কোনো তদারকী ব্যবস্থা নেই|
আবার সনাতনী ব্যাংকিং খাতেও বিবিধ সেবা মাশুলের বাইরে নানাবিধ আর্থিক পণ্য বা সেবার নামে বিভিন্ন ধরনের ঋণের প্রচলন দেখা যায়, যেসবের অন্তর্নিহিত বার্ষিক সুদের হার এক নাও হতে পারে|

এসব জানার পরও ক্ষুদ্রঋণের বছর ভিত্তিক সুদের হার বেধে দেওয়া বেশ দুঃসাহসিক উদ্যোগ(!), যা এই খাতের বিকাশে বিকৃতি আনতে পারে|

সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেছে যে বার্ষিক ভিত্তিতে সুদের হার সর্বোচ্চ ২৭%-এ বেঁধে দেওয়া হচ্ছে| এখন যদি ঋণ সরবরাহকারী কম খরচে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে এবং যোগানের তুলনায় চাহিদার মাত্রা কম হওয়ায় বাজারে সুদের হার ২৭% এর কম হয়, তাহলে হয়তো কোনো সমস্যা হবে না| যদি চাহিদা বেশি হওয়ার কারণে (অথবা মূলধন বা সেবাদান খরচ বেশি হওয়ার কারণে) বাজারে নির্ণিত সুদের হার ২৭% এর বেশি হয়, তাহলে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ২৭% সীমা মানতে গিয়ে লাভ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হবে এবং সার্বিক সরবরাহে আপেক্ষিক ঘাটতি দেখা দিবে| অথচ, ঋণগ্রহীতা বেশি সুদ দিতে প্রস্তুত থাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ম বহির্ভূত লেনদেনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার শংকা রয়েছে| অর্থাৎ বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত না করে সর্বোচ্চ দাম বাঁধার রীতি ব্যক্তি পর্যায়ে অবৈধ আয়ের পথ উন্মুক্ত করে এবং প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুঁজি গড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে| শেষোক্ত বক্তব্য সাধারণভাবে বিনিময়যোগ্য সকল পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য|

দরিদ্র জনসাধারণের হাতে স্বল্পসুদে ঋণ দেয়া নিশ্চিত করতে পারলে তা দারিদ্র্য-বিমোচনের পথ সুগম করে| তাই সুদের হার কমানো বা বেধেঁ দেয়া প্রয়োজন| এই আবেগী যুক্তির তোড়ে ঋণ-সরবরাহের বাণিজ্যিক দিকটি উপেক্ষিত হয়ে পড়ছে| এতে সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'দারিদ্র্য-বিমোচনের' বোঝা চাপিয়ে অদক্ষতার দিকে ঠেলে দেওয়ার পথও তৈরি হচ্ছে|

অদ্ভুতভাবে, দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারায় এই আবেগের প্রকাশ দেখা যায়| দারিদ্র-বিমোচনের কাজে লিপ্ত দেখিয়ে এনজিও/ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাসমূহ নিজেদেরকে প্রচলিত করজালের আওতার বাইরে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে (অর্থাৎ কর না দিয়ে স্বল্পমেয়াদী লাভে আগ্রহী থেকেছে); এবং বিদেশি ঋণদানকারী/সাহায্য সংস্থা এ ব্যাপারে নৈতিক সহায়তা দিয়েছে| অন্যদিকে বিশেষ সহায়তা পায় বলে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ও কার্যবিধির উপর শর্তারোপের দাবি উঠেছে| যেমন, বিশ্বব্যাংকের মত সংস্থা বহু বছর এসব (এনজিও বা ক্ষুদ্রঋণ) প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিরোধীতা করে এসেছে|ক্ষেত্রবিশেষ এর যৌক্তিকতা মেলে যখন ওইসব বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান 'লেভেল-প্রেয়িং'-এর অনুপস্থিতি দেখিয়ে প্রতিবাদ করে|

সবশেষে একটি পুরোনো অথচ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ| আমাদের দেশে ঋণ ও সাহায্যের নামে যে অর্থ বিদেশি সংস্থা থেকে আসে এবং (অনেকক্ষেত্রে) বিদেশি সংস্থা দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তা (ইআরডি-এর সাথে করা) একটি চুক্তির ভিত্তিতে কর-মওকুফের সুবিধা পায়| এত উঁচু পর্যায়ের গলদ যেখানে দৃষ্টির

আড়ালে রয়ে যায় ও এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেও যখন কোথাও উত্তর মেলে না, এনজিও/ক্ষুদ্রঋণ খাতে যা ঘটছে, তা নিতান্তই নগণ্য মনে হয়| এরপরও ইতিবাচক পরিবর্তন কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করা জরুরি|